২. কৃষিনির্ভর শিল্প

২.ক. বস্ত্রবয়ন

মুঘল আমলে বস্ত্রবয়ন শিল্প ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় বস্ত্রের খ্যাতি ছিল জগৎ জুড়ে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা রফতানি করা হত। বস্ত্র তৈরির প্রধান উপকরণ ছিল তুলো, রেশম, পশম, পাট, শণ ও ভেড়ার লোম।

২.ক.১. সুতিবস্ত্র

ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্প প্রসঙ্গে মোরল্যান্ড মন্তব্য করেছেন—"Cotton-weaving was by far the most extensive industry in India, and I think it is fair to say that the aggregate production was one of the great facts of the industrial world of the year 1600."[২] সমসাময়িক একজন পর্তুগিজ পর্যবেক্ষক পাইরার্ড (Pyrard) একটি উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে চিন পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের প্রতিটি নারী ও পুরুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে পোশাক পরে লজ্জা-নিবারণ করত, তার সমস্তই ভারতে তৈরি হত। মোরল্যান্ড এই বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি লক্ষ করলেও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ভারতই এই বিস্তৃত এলাকার

Scanned with CamScanner

মানুষের কাপড়ের চাহিদা মেটাত। এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যে তিনি আরব, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে তখনকার মানুষের চাহিদা নানা কারণে কম ছিল বলে এই রফতানির পরিমাণ আপাতদৃষ্টিতে যতটা বেশি বলে মনে হয়, আসলে তা ছিল না।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতের সর্বত্র তাঁতিরা তাঁত বুনত। ১৬২০-এর দশকে একমাত্র মাসুলিপত্তনমেই ৭০০০ তাঁতি বাস করত। ১৬৪০-এর দশকে বারাণসীতেও সমসংখ্যক তাঁতির বাস ছিল। তবে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে ওঠার সহায়ক হয়েছিল। কিছুকিছু এলাকা ছিল যেগুলি কোনো বিশেষ ধরনের কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। যেমন ঢাকার খুব মিহি কাপড় মসলিন বিখ্যাত ছিল। ভারতের প্রায় প্রতি শহর ও বড়ো গ্রামেই সুতির কাপড় তৈরি হত বলে সমস্ত কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। আবুল ফজল তাই তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সমস্ত এলাকার নাম উল্লেখ না করে কেবল সেইসব অঞ্চলের কথাই বলেছেন, যেগুলি বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে ঢাকা বা সোনারগাঁর উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া বারাণসী, মৌ বা আগ্রা, মালয়, দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের কথাও তিনি বলেছেন। এ ছাড়া লাহোর, মুলতান, গোলকুন্ডা, বুরহানপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি হত।

মুঘল যুগে ভারতে কাপড় তৈরির চারটি প্রধান কেন্দ্র হল—গুজরাট, বাংলা, সিন্ধু উপত্যকা ও দক্ষিণ ভারতের করমন্ডল অঞ্চল। আকবরের আমলে গুজরাট তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে কিংখাব, দোপাট্টা, বদলা, কুর্তা, চিকনের কাজ করা কাপড় ইত্যাদি তৈরি হত। সোনা ও রুপোর কাজ করা কাপড় ও রঙিন কাপড়ের জন্য আহমদাবাদ বিখ্যাত ছিল। তা ছাড়া ব্রোচ, বরোদা, সুরাটের নিকটবর্তী নভপুর প্রভৃতিও তাঁত শিল্পের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু ১৬৩০ সালের দুর্ভিক্ষের পর তাঁত শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে গুজরাট তার গুরুত্ব হারায় এবং বাংলা সেই স্থান দখল করে। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, মারাঠা আক্রমণ ও পারস্য উপসাগরে রফতানির বাজার বন্ধ হওয়ার জন্য গুজরাটের বস্ত্রশিল্প আরও মার খায়। গুজরাট ছাড়া পশ্চিম ভারতে মালবের কাপড়ও খুব বিখ্যাত ছিল।

মুঘল যুগে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলো উৎপন্ন হত। ইবন বতুতার ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, তখন বাংলায় খুব উৎকৃষ্ট ধরনের কাপড় অল্প দামে বিক্রি হত। ঢাকা বা সোনারগাঁর সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র, টেরির মতে যা ইউরোপের সূক্ষ্মতম বস্ত্রের চেয়েও উৎকৃষ্ট, বিখ্যাত হলেও মালদহ, সাতগাঁ, শাহবাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে, এমনকি অনেক দূরবর্তী গ্রামেও তা তৈরি হত। রাজদরবার ছাড়া বিদেশেও মসলিন বস্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। আকবরের সময়ে সরকার বরকাবাদে 'গঙ্গাজল' নামে উৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈরি হত। বাংলা ছাড়া বিহার ও ওড়িশাতেও ভালো কাপড় তৈরি হত। ওড়িশার বালেশ্বরে লাল রং-এর সস্তা অথচ চমৎকার সুতিবস্ত্র বিখ্যাত ছিল। র‍্যালফ ফিচ, পার্কার, পেলসার্ট,

Scanned with CamScanner

মানুচি প্রভৃতি বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হত পাটনায়। পাটনা সুতিবস্ত্র উৎপাদনের একটি বড়ো কেন্দ্র ছিল।

সিন্ধু উপত্যকায় তট্টা, সুক্কুর, মুলতান, শিয়ালকোট ও লাহোর তাঁত শিল্পের বড়ো কেন্দ্র ছিল। চিকনের কাজের জন্য শিয়ালকোট বিখ্যাত ছিল। এই অঞ্চলে পোশাক ছাড়া বিছানার চাদর, কার্পেট, গৃহসজ্জার বিভিন্ন জিনিস, দড়ি, এমনকি সেনাবাহিনীর জন্য তাঁবুর কাপড় পর্যন্ত তৈরি হত। এই অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে আরবে সুতিবস্ত্র রফতানি হত। পর্তুগিজরা এই অঞ্চলের বাণিজ্যে সক্রিয় ছিল।

দক্ষিণ ভারতে করমন্ডল উপকূল ও গোলকুন্ডা তাঁত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পুলিকটের উত্তরে করমন্ডল উপকূলের উত্তর অঞ্চলে এক ধরনের সাদা কাপড় তৈরি হত, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে যার যথেষ্ট কদর ছিল। দক্ষিণ করমন্ডল অঞ্চলে তৈরি নীল, লাল ও চেকের কাপড় খুব বিখ্যাত ছিল। মাসুলিপত্তনম ও পন্ডিচেরি বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। করমন্ডল অঞ্চলের বস্ত্র সালোমপোর, মুর, পরকলা ইত্যাদি খুব বিখ্যাত ছিল। এই অঞ্চল থেকে কাপড় রফতানি করা হত প্রধানত পেগু, মালাক্কা ও স্থানীয় বিভিন্ন দ্বীপে। করমন্ডল ছাড়া দাক্ষিণাত্যের বস্ত্র শিল্পের দুটি প্রধান কেন্দ্র হল আওরঙ্গাবাদ ও বুরহানপুর। এই দুটি জায়গার সাদা কাপড়ের খুব খ্যাতি ছিল।

এইসব প্রধান কেন্দ্র ছাড়া দিল্লি, আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি, অযোধ্যা, জৌনপুর, মালাবার অঞ্চল, খান্দেশ প্রভৃতিও বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লির লাল শালু ও ছাপা কাপড়ের সুনাম ছিল। মথুরার সন্নিকটে গোকুলে তৈরি হত 'গুজি' নামে এক ধরনের কাপড়। অযোধ্যায় মোটা কাপড় ও গুজি তৈরি হত লখনউ শহরে। এই অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র হল দরিয়াবাদ, খইরাবাদ, আকবরপুর, জালালপুর, জৌনপুর ও এলাহাবাদ।

ভারতে তৈরি সুতিবস্ত্রের বৈচিত্র্য ইউরোপীয় পর্যটকদের বিশেষভাবে নজরে পড়েছিল। ইংরেজ কুঠির প্রথম দশ বছরের নথিপত্রে ১৫০ রকমের কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। কাপড়ের মান ও বৈচিত্র্য নির্ভর করত কী ধরনের সুতো, অর্থাৎ মোটা না সরু, ব্যবহার করা হয়েছে, তার উপর। সুতোর সংখ্যাও বিচার করা হত। সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র হিসাবে দক্ষিণ ভারত ও বিশেষত বাংলার তৈরি মসলিন বস্ত্র ছিল জগদ্‌বিখ্যাত। কোনো কোনো অঞ্চলের তৈরি কাপড়ের এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যে, সেই অঞ্চলের নামেই কাপড়ের নামকরণ করা হত, যেমন দরিয়াবাদি, খইরাবাদি ইত্যাদি। মাপ, মান ও রং-এর উপর ভিত্তি করেও কোনো কোনো কাপড়ের নামকরণ করা হত। যদিও অধিকাংশ ধরনের কাপড় প্রায় সব জায়গাতেই তৈরি হত, তবু লং ক্লথ তৈরির জন্য উত্তর করমন্ডল ও উত্তর ভারত; মসলিন কাপড়ের জন্য বাংলা ও দক্ষিণ ভারত, ছাপা কাপড়ের জন্য দক্ষিণ ভারত (করমণ্ডল) এবং সুতো ও রেশম মিশিয়ে তৈরি এক ধরনের কাপড়ের জন্য গুজরাটের খ্যাতি ছিল। নাগাপত্তনমের কেলিকো (ক্যালিকো), ছাপা সুতির ছিট কাপড়,

Scanned with CamScanner

মচ্ছিওয়াড়ার (দিল্লি সুবা) বাফতা, সিলেটের সালাহতি, কাঞ্চিপুরমের কাঞ্চিবানি, তাঞ্জোরের তানচেরাও বিখ্যাত ছিল। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে যে সম্প্রদায়ের তাঁতি কাপড় বুনত, সেই সম্প্রদায়ের নামেও কাপড়ের নামকরণ করা হত। যেমন 'জেদারু' (Jedaru) কাপড়। যেসব দেশে কাপড় রফতানি করা হত, সেখানকার মানুষের চাহিদা ও রুচির কথা মনে রেখেই কাপড় তৈরি করা হত।

সুতো থেকে যে কেবল পরিধেয় বস্ত্র তৈরি হত, তা নয়; বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, সুতির কার্পেট, রুমাল, দড়ি, তাঁবুর কাপড় ইত্যাদিও তৈরি হত। আবুল ফজল ১১ ধরনের তাঁবুর কাপড়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব মজবুত কাপড়ের দামও হত খুব বেশি। সবচেয়ে কমদামি তাঁবুর কাপড়ের দাম ছিল ১০,০০০ টাকা। সুতিবস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু-ধরনের শিল্প-উদ্যোগের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল কাপড় রং করার ও দ্বিতীয়টি হল সুতো তৈরির শিল্প। রং করার কাজ অবশ্য সুতিবস্ত্র ছাড়া অন্যান্য ধরনের কাপড়েও করতে হত। তবে সুতোর কাপড়েই রং-এর ব্যবহার হত বেশি। ব্রহ্মদেশে রঙিন কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল। নানারকম গাছগাছড়ার নির্যাস দিয়ে কাপড় রং করা হত। আল, জাফরান ফুল, মাজেথা, তুন, পতংগ (সাপান কাঠ), বাবলু, খয়ের প্রভৃতি দ্রব্যের সাহায্যে কাপড় রং করা হত। রং করার জন্য পেশাদার লোক নিযুক্ত করা হত। গোলকুন্ডা, নিজামপত্তম, আরমাগাঁও, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের ছাপা কাপড় ছিল খুব বিখ্যাত। ছাপার কাজে গোলকুন্ডার কারিগরদের খুব খ্যাতি ছিল। ছাপার কাজে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। এই রকম একটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হল 'মাসুলিপত্তনম চিনটজ'। আহমদাবাদ ছিল আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে মুদ্রক নামে একটি রাস্তাও ছিল।

সুতো কাটা বা তৈরি ছিল স্বতন্ত্র একটি কর্মোদ্যোগ। তাঁতিদের কাছে এটি ছিল দ্বিতীয় একটি পেশা। তবে অনেক কৃষকও কাজের ফাঁকে এই কাজ করত। চাষি পরিবারের মহিলারা ছিল এই কাজে খুব দক্ষ। সুতো কাটা হত চরকার সাহায্যে। কেউ কেউ নিজের জমিতে তুলোর চাষ করে তা থেকে সুতো কাটত; আবার কেউ কেউ তুলো কিনে সুতো তৈরি করত। যেসব তাঁতি রফতানির জন্য কাপড় তৈরি করত, তাদের অনেকেই তৈরি করা সুতো ব্যবহার করত। সুতো তৈরির কেন্দ্র হিসাবে ব্রোচ, বালেশ্বর, কাশিমবাজার প্রভৃতি শহরের খুব নামডাক ছিল। জাহাঙ্গিরের সময়ে এক পাউন্ড উৎকৃষ্ট সুতোর দাম ছিল ৬ থেকে ৭ টাকা। ইংরেজরা গুজরাট, বুরহানপুর ও বাংলা থেকে সুতো রফতানি করত। এইসব সুতো অবশ্য মোটা ধরনের হত, কারণ ইউরোপের তাঁতিরা সূক্ষ্ম সুতোর কাপড় বুনতে পারত না। যাই হোক, ভারতে তৈরি সুতো ছিল বিশ্ববিখ্যাত। শাহজাহানের সময় প্রচুর সুতো বিদেশে রফতানি করা হয়েছিল। বাংলার মসলিন কাপড়ের জন্য যে সুতো ব্যবহার করা হত, তা তৈরি করত ঢাকায় এক শ্রেণির বিশেষভাবে দক্ষ কারিগর।

বস্ত্রবয়ন শিল্পে কেউ সুতো কাটত, কেউবা কাপড় রং করত ও তাঁতিরা কাপড় তৈরি করত বলে এই শিল্পে শ্রমবিভাজন লক্ষ করা যায়। অনেক সময় শিল্পীরা সমবেতভাবে

Scanned with CamScanner

কাজ করত। সাধারণভাবে এই শিল্প পরিবারভিত্তিক ছিল। বংশপরম্পরায় তারা এই কাজ করত। পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই, এমনকি শিশুরাও কাজে হাত লাগাত। যেখানে কাজের চাপ বেশি ছিল বা বিদেশি বণিকদের চাহিদা মেটানোর জন্য বড়ো তাঁতিরা অনেক সময় পরিবারের বাইরে থেকে কিছু তাঁতি নিয়োগ করত। উৎপাদন সাধারণভাবে পরিবারভিত্তিক হওয়ায় উৎপাদনের মান একরকম হত না। তাঁতিরা আবার অনেক সময় কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকত। অবশ্য কর্ণাটকের বেশিরভাগ তাঁতি কৃষিকাজ করত না। এখানকার কোনো কোনো তাঁতি আবার দিনমজুর খাটত। অর্থাৎ তাঁতিদের মধ্যে স্তরভেদ ছিল। কেউ কেউ ছিল ধনী ও সম্পন্ন; আবার কেউ কেউ খুব গরিব ছিল। কর্ণাটকে কয়েকটি তন্তুবায় সম্প্রদায় যেমন, দেবঙ্গ (Devanga), জেদারু (Jedaru), মগ্গদাবারু (Maggadavaru) ইত্যাদি খুব প্রভাবশালী ছিল। এইসব সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মন্দির নির্মাণে অর্থব্যয় করত। আবার যেসব তাঁতি স্থানীয় চাহিদা মেটাত, তাদের সঙ্গে যেসব তাঁতি বিদেশি বণিকদের জন্য কাপড় বুনত, তাদের বড়ো ধরনের তফাত ছিল। প্রথমোক্ত তাঁতিদের বলা হত 'নাকুমি', আর দ্বিতীয়দের 'কুমি'। নাকুমিরা সস্তার মোটা কাপড় তৈরি করত। এরা দামি কাপড় তৈরির কায়দাকানুন জানত না। আসলে এরা পেশায় ছিল কৃষক ও অবসর সময়ে তাঁত বুনত। সব ধরনের গ্রামীণ বস্ত্রশিল্পীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ১৬৭৬ সালে মাদ্রাজে একজন ইংরেজ পর্যটক লিখেছেন—'ইউরোপে তাঁতিরা নিজেদের সম্পত্তি বাড়াচ্ছে ..... এখানে ঠিক উল্টো... গরিব তাঁতিরা ..... দিন আনে দিন খায়, কদাচিৎ তারা আগাম টাকা ছাড়াই কাপড় তাঁতে বুনতে পারে।" নতুন উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধিতে বা ব্যবহারে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। বার্নিয়ের ও পেলসার্টের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, দালাল থেকে সরকারি কর্মচারী সবাই তাদের নানাভাবে শোষণ ও অত্যাচার করত। অনেক সময়েই তারা তাদের জিনিসের দাম ঠিকমতো পেত না এবং তাদের নানাভাবে ঠকানো হত। এই অবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন বা প্রযুক্তিগত কোনো উন্নয়ন সম্ভবপর ছিল না। ঢাকায় যারা মসলিন বস্ত্র তৈরি করত, তাদের কথা অবশ্যই আলাদা। তাদের কার্যকলাপ মূলত শহরভিত্তিক ও কোনো না কোনো কোম্পানির কাজের সঙ্গে তারা জড়িত থাকত। সাধারণভাবে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির পাশে শিল্পীদের দারিদ্র্য কিছুটা দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়।

সাধারণভাবে গরিব মানুষ মোটা কাপড় বা কামিন পরত। মিহি বা দামি কাপড় পরত সমাজের উঁচু তলার মানুষ। সুলতানি আমলে চরকা ও পিন্‌জানা নামে এক যন্ত্র চালু হওয়ায় উৎপাদন অনেক বেড়েছিল। ইরফান হাবিবের মতে এর ফলে দক্ষতা বেড়েছিল ছয় গুণ। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে এই যুগে উৎপাদন ও ভোগ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। cont....

২.ক.২. রেশম শিল্প

সুতির কাপড় ছাড়া রেশম বা সিল্ক শিল্পের জন্যও ভারতের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রেশম শিল্প ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। তুঁত গাছের চাষ, গুটিপোকা ও রেশমকীট থেকে রেশম

Scanned with CamScanner

উৎপন্ন হত। রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল গুজরাট, বাংলা ও কাশ্মীর। পঞ্চদশ শতকেও বাংলায় গুটিপোকার চাষ অজ্ঞাত ছিল। তবু সপ্তদশ শতকে এখানে রেশমবস্ত্রের উৎপাদন ও রফতানি দুই-ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর আগে ভারতে রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল গুজরাট। তা ছাড়া রেশম শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে আগ্রা, লাহোর, ফতেহপুর এবং সম্ভবত পাটনা ও তট্টার উল্লেখ পাওয়া যায় মানুচি ও ম্যানরিকের বিবরণে। গুজরাটে যে রেশমবস্ত্র তৈরি হত, তার কাঁচামাল আসত চিন থেকে। সপ্তদশ শতকের শেষে অবশ্য বাংলার কাঁচামাল চিনের বাজার নষ্ট করে দেয়। কাশিমবাজারে যে পরিমাণ রেশমগুটি উৎপন্ন হত, তার বেশিরভাগ (তিন ভাগের দুই ভাগ) গুজরাটে চালান হয়ে যেত। সপ্তদশ শতকে কাশিমবাজারে ২·৩ মিলিয়ন পাউন্ড কাঁচা রেশম উৎপন্ন হত। ট্যাভারনিয়েরের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, কাশিমবাজার থেকে কয়েক হাজার পেটি রেশম বাইরে রফতানি হত।

আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায় আকবর নাকি রেশম শিল্পের প্রসারে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং এই শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি বিদেশি কারিগরদের খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উৎসাহে আগ্রায় এই শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। সম্রাট ও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্য ছাড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষও এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিল। জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলেও এই শিল্পের বিপুল প্রসার ঘটেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে গুটিপোকা থেকে সুতো বের করার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। সুতিবস্ত্র শিল্পের মতো রেশম শিল্পেও শ্রম-বিভাজন নীতি লক্ষ করা যায়। বাংলায় তাঁতিরা ছাড়া 'নকদ' নামে এক শ্রেণির মানুষ রেশম সুতো বুনত ও তারা তা সরবরাহ করত। যারা গুটিপোকা রক্ষা করত ও তুঁত গাছ চাষ করত, তাদের বলা হত 'চসর'।

মোরল্যান্ডের মতে ষোড়শ শতকে ভারত থেকে যে পরিমাণ রেশম বাইরে রফতানি করা হত, তা এমন কিছু বেশি ছিল না। বারবোসার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গুজরাট থেকে কিছু রেশমি বস্ত্র পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ও পেগুতে রফতানি করা হত। ভারথেমা ছাড়া অন্যান্য বিদেশি পর্যটকও মোটামুটি একই কথা বলেছেন। ভারথেমা জানিয়েছেন যে, গুজরাটি রেশমি বস্ত্র সমগ্র পারস্য, তুরস্ক, আরব, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে রফতানি করা হত। মোরল্যান্ড অবশ্য ভারথেমার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। ভারথেমা রেশমি বস্ত্র ও সুতিবস্ত্রের মধ্যে তফাত করতে পারেননি বলেই এই ভুল করেছেন। তাঁর মতে এটা হতে পারে যে, ভারথেমা উল্লেখিত দেশগুলিতে সুতিবস্ত্রের সঙ্গে কিছুকিছু রেশমি বস্ত্র হয়তো চালান যেত। কিন্তু তার পরিমাণ কখনোই বেশি ছিল না। অন্যদিকে ট্যাভারনিয়েরের বিবরণ ও পাটনার প্রথম ইংরেজ বাণিজ্য মিশনের (১৬১৮-২১) হিসাব থেকে জানা যায় সপ্তদশ শতকে ভারতীয় রেশমবস্ত্রের রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ বণিকরা জাপানের বাজারে ভারতীয় রেশমবস্ত্র বিক্রি করত। অন্যদিকে ইংরেজরা বাংলার কাঁচা রেশম ইউরোপের বাজারে রফতানি করত। রেশমি বস্ত্র ছাড়াও কার্পেট ও সোনারুপোর নকশাকাটা বিভিন্ন মূল্যবান বিলাস-সামগ্রী তৈরি হত। তসর ও মুগার তৈরি কাপড়ও ভারত থেকে রফতানি হত।

Scanned with CamScanner

২.ক.৩. পশম

উল বা পশম তৈরি হত ভেড়া, উট, ছাগল প্রভৃতি পশুর লোম থেকে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলে পশমের তৈরি পোশাকের চাহিদা আনুপাতিক হারে কম ছিল। তবে শীতের সময়ে ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেরই গরম জামার প্রয়োজন হত। বয়ন শিল্প হিসাবে পশম শিল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই। মোরল্যান্ডের মতে তখনকার দিনে সাধারণ মানুষ পশমের গরম জামা পরত না। তবে সমাজের উপরতলার ধনী মানুষের কাছে পশমের তৈরি কাপড়ের চাহিদা ছিল। আবুল ফজল যে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা দিয়েছেন, তাতে পশমের তৈরি কম্বলের উল্লেখ আছে। পশম ছাড়া শাল ও কার্পেট সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের পশম খুব একটা উচ্চমানের ছিল না। সেইজন্য তিব্বত ও হিমালয় অঞ্চল থেকে অনেক সময় তা আমদানি করতে হত।

বার্নিয়েরের বক্তব্য থেকে জানা যায় কাশ্মীরের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল শাল। তিনি বলেছেন এমনকি শিশুরাও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। শাল শিল্প সম্পর্কে স্বয়ং বাদশাহ আকবর আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, দক্ষ বিদেশি কারিগর যাতে ভারতে বসবাস করে, তার জন্য আকবর তাদের উৎসাহ দিতেন। কাশ্মীরি শালের অনুকরণে আগ্রা, পাটনা ও লাহোরেও শাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বরং পারস্যের অনুকরণে ভারতে কার্পেট তৈরির প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। লাহোর ও আগ্রায় কার্পেট তৈরি হত। তবে মোরল্যান্ডের মতে এই শিল্পের কারিগররা কার্পেটে কোনো অভিনবত্ব আনতে পারেননি। তাঁদের তৈরি কার্পেটের মান যেমন ভালো ছিল না, তেমনই তার উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য ছিল না। ফলে পারস্য থেকে কার্পেট আমদানি করতে হত। অবশ্য দামি এই জিনিসটির চাহিদা খুব একটা ছিল না। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানের কমদামি কম্বল উৎপন্ন হত। সবচেয়ে কমদামি কম্বল পাওয়া যেত মাত্র ১০ দামে। আকবরের সময়ে কম্বলের চেয়ে গমের দাম ছিল বেশি। দক্ষিণ ভারতে পশমের কাপড়ের খুব একটা চাহিদা ছিল না। উত্তর ভারতে পয়সাওয়ালা মানুষ ইটালি, তুরস্ক ও পারস্য থেকে আমদানি করা পশমি বস্ত্র ব্যবহার করত।

২.ক.৪. শণ ও পাট

সবশেষে আসা যাক শণ ও পাটের তৈরি কাপড়ের কথায়। শণ সম্পর্কে আমাদের হাতে খুব বেশি তথ্য নেই। তবে মুঘল আমলে ভারতের প্রায় সর্বত্র শণ জন্মাত বলে জানা যায়। কিন্তু তার পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। শিল্পের প্রয়োজনেও তা খুব একটা ব্যবহার করা হত না, যদিও ঘরোয়া কাজে তার কদর ছিল। শণের তৈরি দড়ি জাহাজের কাজে লাগত। পাট উৎপন্ন হত বাংলায়। রেশমজাত দ্রব্য রফতানি করার জন্য যে পেটি ব্যবহার করা হত, তা বাঁধার জন্য দড়ি তৈরির কেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজারের খুব নামডাক

Scanned with CamScanner

ছিল। মোরল্যান্ড এক জায়গায় বলেছেন যে, বাংলার গরিব মানুষ পাটের তৈরি কাপড় পরত। তাঁর এই অভিমত আধুনিক ঐতিহাসিকরা যথার্থ বলে মনে করেন না। আসলে মোরল্যান্ড আইনে ব্যবহৃত 'তাটবন্দ' কথাটির অর্থ বুঝতে পারেননি বা ভুল বুঝেছেন। এই কথাটির প্রকৃত অর্থ 'ইরি' সিল্ক, পাট নয়। আলিবর্দি খানের আগে বাংলায় পাটের কাপড়ের প্রচলন ছিল না।

২.খ. শর্করা শিল্প

বস্ত্রবয়ন শিল্পের মতো শর্করা শিল্পও ছিল কৃষিনির্ভর। এর প্রধান উপকরণ ছিল আখ ও তালের রস। এ থেকে তৈরি হত চিনি ও গুড়। আখের রস কীভাবে নিষ্কাশিত হত, তার বিবরণ দিয়েছেন ইরফান হাবিব। দক্ষিণ ভারতে কাঠের রোলার ব্যবহার করা হত এই উদ্দেশ্যে; আর উত্তর ভারতে ব্যবহৃত হত পাথরের রোলার। উভয় অঞ্চলেই রোলার ঘোরানো হত বলদের সাহায্যে। লোহার রোলার ব্যবহৃত হয় ইংরেজ আমলে উনিশ শতকের শেষ দিকে। এই নিষ্কাশিত রস একটি বড়ো লোহার কড়ায় ফোটানো হত। পরে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোধন করে বিভিন্নরকম ও মানের গুড় ও চিনি তৈরি করা হত। আবুল ফজল পাঁচরকম চিনির কথা বলেছেন—তালের গুড়, যা ব্যবহার করত ময়রা ও গরিব মানুষ, লাল অথবা চিনি (আধুনিক ভুরা), সাদা রঙের গুঁড়ো চিনি, মিছরি এবং নবট বা নবত, অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট দানা চিনি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিনি উৎপন্ন হত। তবে সবচেয়ে ভালো ও সস্তা চিনি প্রস্তুত হত বাংলায়। তা ছাড়া আগ্রা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল, মুলতান ও ওড়িশাতেও চিনি উৎপন্ন হত। বাংলা থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চিনি রফতানি হত। সমুদ্রপথে মালাবার ও নদীপথে দিল্লি ও আগ্রাতে চিনি পাঠানো হত। ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিক মারফত বাংলার চিনি পারস্য ও ইউরোপেও রফতানি করা হত। ১৬৪০-এর দশকে ওলন্দাজ বণিকরা একমাত্র পারস্যতেই বাৎসরিক চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ পাউন্ড চিনি বিক্রয় করত। এই ব্যাপারে ইংরেজদের আগ্রহ অবশ্য ক্ষণস্থায়ী ছিল। চিনি উৎপাদনের আর একটি কেন্দ্র ছিল আহমদাবাদ। ভালো জাতের সাদা মিছরি উৎপন্ন হত লাহোরে। মুঘল আমলে চিনির দাম ছিল যথেষ্ট বেশি। সাধারণ মানুষ তাই গুড়ই বেশি ব্যবহার করত। আকবরের আমলে সাদা চিনি ছিল বিলাস-সামগ্রী। রাজধানীতে সাদা চিনির দাম ছিল মন প্রতি ১২৮ দাম; আর মিছরির দাম ছিল মন প্রতি ২২০ দাম।

২.গ. তেল

মুঘল আমলে ভারতের সর্বত্র গ্রাম ও শহরে তেলিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তেলিদের কাজ ছিল সর্ষে, তিল প্রভৃতি তৈলবীজ থেকে তেল তৈরি করা। বলদের সাহায্যে ঘানিতে পাথর দিয়ে পিষে তৈলবীজ থেকে তেল বার করা হত। তেল শুধু রান্নার কাজেই লাগত না, আলো জ্বালার কাজেও তেল ব্যবহৃত হত। অনেক সময় তেলিরা

Scanned with CamScanner

মন্দির ও মসজিদে আলো জ্বালার জন্য তেল সরবরাহ করত। মহারাষ্ট্রের লিপি থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। পাটন লিপিতে বলা হয়েছে যে, তেলিকাররা মঠে নিয়মিত তেলের জোগান দিত। সম্ভবত সরকার তেলিদের কাছ থেকে সরাসরি কর আদায় না করে এইভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকেন্দ্রে তেল জোগানের ব্যবস্থা করত। মহারাষ্ট্রের গ্রামে তেলিরা অনেক সময় মহাজনি ব্যবসা করত। ভোজ্য তেল ছাড়া সুবাসিত তেলও প্রস্তুত হত। যেমন মেদিনীপুরে ফুল থেকে এক ধরনের সুগন্ধি তেল উৎপন্ন হত। গোয়ালিয়রের চামেলি তেল বিখ্যাত ছিল। গুজরাটের র‍্যান্ডার (Rander) ও নবসরিতেও (Navsari) সুগন্ধি তেল প্রস্তুত হত।

২.ঘ. নীল

মুঘল আমলে নীল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী বা বাণিজ্যিক ফসল ছিল। কাপড় রং করতে বা ফর্সা করতে নীল ব্যবহৃত হত। স্বাভাবিক ভাবেই কাপড় তৈরির কেন্দ্রগুলিতে (আগ্রা, মাসুলিপত্তনম, ঢাকা, কাশিমবাজার, আহমদাবাদ ইত্যাদি) নীলের চাহিদা ছিল। সাধারণভাবে নীল তৈরি করার পর তা বাজারে বিক্রি করা হত। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে, যেমন গুজরাটে, চাষিরা কাঁচা নীলপাতা দালালদের কাছে বিক্রি করে দিত। দালালরা তারপর নীল তৈরি করে বাজারে বেচত। নীলের চাষ হত জুন মাসের শেষে। নীলের পাতা তিনবার কাটা হত। প্রথমটিকে বলা হত 'নৌতি' (Nauti)। তখন তার রং থাকত লালচে, দ্বিতীয়টিকে বলা হত 'জেরি' (Jerry)। সেই সময় নীলের পাতা হত বেগুনি রং-এর। আগস্ট মাসের মধ্যে এই রং ধরত। এই পাতাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট এবং এরই চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। তৃতীয় বারের কাটাকে বলা হত কাটেল (Katel)। এর মান আদৌ ভালো ছিল না। অল্প বা বেশি বৃষ্টি হলে অথবা ঠিক সময় বৃষ্টি না হলে এবং প্রচণ্ড ঠান্ডায় নীলচাষের ক্ষতি হত। পঙ্গপালের আক্রমণও ফসল নষ্ট করে দিত। নীল তৈরি করার কাজও যথেষ্ট যত্ন সহকারে করতে হত। একটি বড়ো চৌকো বা গোলাকার চৌবাচ্চায় ক্ষারের জলে নীল পাতাগুলিকে ১৬ থেকে ১৭ ঘন্টা চুবিয়ে রাখা হত। এর ফলে পাতার রং জলের সঙ্গে মিশে যেত। এরপর তা অন্য একটি গোলাকার পাত্রে তুলে মন্থন করা হত এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস বার করে নেওয়া হত। এরপর নীল তৈরি হত। নীল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বায়ানায় দুটি ভিন্ন চৌবাচ্চায় এইভাবে নীল তৈরির কাজ হলেও কোনো কোনো অঞ্চলে একটি চৌবাচ্চাতেই চুবানো ও মন্থন দুটি কাজই হত। পেলসার্টের মতে বায়ানায় তৈরি নীলের উৎকর্ষের কারণ উৎকৃষ্ট ক্ষার ও জলের ব্যবহার। আবার কেউ কেউ মনে করেন দুটি স্বতন্ত্র চৌবাচ্চা ব্যবহারের ফলেই বায়ানায় উৎকৃষ্ট নীল তৈরি হত। অনেক সময় আবার শুকনো পাতা দিয়েও নীল তৈরি হত। নীলের চাষ এত লাভজনক ছিল যে, স্বয়ং শাহজাহান এতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

নীলচাষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বড়ো কেন্দ্র ছিল আগ্রা অঞ্চল, বিশেষত বায়ানা (বিয়ানা)। এরপর ছিল গুজরাটের সরখেজের স্থান। উত্তর ও দক্ষিণ করমন্ডলেও নীলের

Scanned with CamScanner

চাষ হত ব্যাপকভাবে। তা ছাড়া জয়পুর, বুলন্দশহর, বুরহানপুর, পূর্ব খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চলও নীলচাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। নীচু মানের নীল ভারতের প্রায় সর্বত্র উৎপন্ন হত। মান ও উৎকর্ষের উপর নীলের দাম নির্ভর করত। ১৬১৪ সালে মাসুলিপত্তনমে তৈরি নীলের দাম পড়ত পাউন্ড প্রতি ১২ পেন্স, সুরাটে ১৩½ পেন্স; সরখেজে মন প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা। পেলসার্টের মতে বায়ানায় নীলের দাম ছিল মন প্রতি ৩০ টাকা। উৎকৃষ্ট বায়ানা নীলের দাম অন্য নীলের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি হত। নীলের দাম অবশ্য নির্ভর করত উৎপাদন, বৃষ্টিপাত, উৎকর্ষ, ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, অভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রভৃতি নানা কারণের উপর। নীলের উৎপাদনও নির্ভর করত কতকগুলি বিশেষ কারণের উপর। যেমন সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তৈরি নীলের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নীলের চাষ যথেষ্ট মার খায়। জাঠ ও সত্‌নামি বিদ্রোহের ফলে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, তার ফলেও নীলের চাষ ব্যাহত হয়। ১৬৩০-৩২ সালের দুর্ভিক্ষ গুজরাটের নীলচাষকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে চাষিরা অনেক সময় বাজারের দামের ওঠানামার দিকে নজর রেখে নীলের চাষ করত। দুর্ভিক্ষের পর গুজরাটে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ায় চাষিরা নীলের চাষ ছেড়ে খাদ্যশস্য চাষের দিকে মন দেয়। ফলে নীলের উৎপাদন ও জোগান কমে যায়। করমন্ডলেও চাষিদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল।

ষোড়শ শতকে বাণিজ্যের জন্য নীলের চাহিদা ছিল না। কিন্তু সপ্তদশ শতকে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় নীলের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। পশ্চিম ভারত থেকে নীল আমদানি করে পর্তুগিজরা বিপুল পরিমাণ লাভ করেছিল। পরে স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরাও এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে। এইসব বিদেশি বণিকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ভারত থেকে নীল রফতানি হত পূর্ব ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে। তা ছাড়া তুরস্ক, পারস্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার কঙ্গোতেও ভারতীয় নীলের চাহিদা ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জলবায়ুর জন্য নীলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় নীলের বাণিজ্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তৈরি নীলের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নীলের চাহিদা কমতে থাকে। নীলে ভেজাল দেওয়ার প্রবণতার ফলেও ভারতীয় নীলের সুনাম নষ্ট হতে থাকে। শুধু ইউরোপ নয়, পারস্য, বসরা ও মোখাতেও ভারতীয় নীলের বাজার সংকুচিত হতে থাকে।

২.৬. অন্যান্য কৃষিনির্ভর শিল্প

অন্যান্য কৃষিনির্ভর শিল্পের মধ্যে তামাক, আফিম, মাদক দ্রব্য, জাফরান প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। ভারতে তামাকের ব্যবহার শুরু হয় আকবরের আমলে। পর্তুগিজদের হাত ধরে তামাকের আবির্ভাব ঘটে ভারতে। তারপর থেকে তামাকের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। সপ্তদশ শতকে তামাকের ব্যাপক প্রচলন হয়। ভারতে

Scanned with CamScanner

তামাকের প্রচলন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তিন থেকে চার বছরের ছেলেরাও নাকি ধূমপান করত। মানুচির বর্ণনা থেকে জানা যায় তামাক-চাষিদের নাকি প্রতিদিন ৫,০০০ টাকা শুল্ক দিতে হত। তামাকের চাষ হত সুরাট, দাক্ষিণাত্য, বুরহানপুর, করমন্ডল, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে। সুরাট ও করমন্ডল উপকূল থেকে তামাক রফতানি হত মোখা, আরাকান ও পেগুতে।

আফিম তৈরি হত পোস্ত গাছের ফুল থেকে। মাদক ও ঔষধ হিসাবে আফিমের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিহার ও মালবে আফিম তৈরির ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে। তা ছাড়া বেরার, সাজিপুর, খান্দেশ, বেনারস, বাংলা ও রাজপুতানাতেও আফিমের চাষ হত। আফিম রফতানি হত পেগু, জাভা, মালয়, চিন, পারস্য ও আরব দেশে। মদ তৈরি হত তাল ও খেজুরের রস থেকে। তা ছাড়া মহুয়া, পচা ভাত ও গুড় থেকেও মাদক দ্রব্য তৈরি হত। আওরঙ্গজেব ছাড়া মুঘল সম্রাটরা মদ খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। আকবর নিজে তাড়ি ও আফিম খেতেন। তবে মুঘল সম্রাটরা মদ্যপ হলেও সাধারণ মানুষ যাতে মদ না খায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন এবং মাঝেমাঝে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন। তবে তাতে কাজ হত না। সম্রাট শাহজাহান অবশ্য কিছুটা সফল হয়েছিলেন। তবে তাঁর নিষেধাজ্ঞা সর্বত্র কার্যকর হয়নি।

Scanned with CamScanner